মৃত্যুর সামাজিক মনস্তত্ত্ব

ডঃ মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান*

সার-সংক্ষেপঃ বর্তমান প্রবন্ধে মৃত্যুকে সংজ্ঞায়িত করার সমস্যা, মৃত্যু ও সমাজকাঠামো এবং মৃত্যুর প্রতি মনোভাব সম্পর্কেই প্রধানতঃ আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে মৃত্যু (হত্যা বা আত্মহত্যা জনিত ছাড়া অন্যান্য মৃত্যু) একটি ঘটনা নয় বরং এটা একটা প্রক্রিয়া। আধুনিক উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতি মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা রাখছে যাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বেশ কিছু সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, আর্থিক, নৈতিক ও আইনগত সমস্যা। মৃত্যু ও সমাজকাঠামো একে অপরকে প্রভাবিত করে। মৃত্যু একটি পরিবার, সমাজ, এমনকি কারও কারও মৃত্যু একটি জাতিকে নাড়া দেয়। আবার আর্থিক শ্রেণী ভেদে মৃত্যুর ধরণ এবং মৃত্যুর স্থান পরিবর্তিত হয়। মৃত্যুর প্রতি মনোভাব বেশ জটিল এক প্রক্রিয়া। বর্তমানে যদিও মৃত্যুভীতি এবং মৃত্যুকে এড়িয়ে চলাই একটি সাধারণ প্রবণতা তথাপি সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে মৃত্যুর প্রতি মনোভাব একই রকম ছিলনা। আধুনিক সমাজে মৃত্যু বাড়ী থেকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং সেখানে এক বিশেষ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসাও মৃত্যু সংঘটিত হচ্ছে। হাসপাতালে মুমূর্ষ রোগী এবং মৃত-পথযাত্রী রোগীর কাছে আপনজনদের যাওয়া খুবই সীমিত। এ কারণে ইউরোপ ও আমেরিকায় 'হসপাইস আন্দোলন' গড়ে উঠেছে। এর উদ্দেশ্য মৃত্যু পথযাত্রী রোগীর জন্য সর্বাধিক আরাম নিশ্চিত করা, একটি মনোরম পরিবেশে রোগীকে আপনজনদের কাছে থাকতে দেওয়া, বেদনানাশক ড্রাগ দিয়ে অচেতন না করে সর্বোচ্চ মাত্রায় সেবাদান করা; পাশা পাশি অধিক সময় বাঁচিয়ে রাখার বীরোচিত পন্থা পরিহার করে স্বাভাবিক চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া। বস্তুতঃ এ সব উদ্যোগ মৃত্যুর প্রতি পরিবর্তনশীল মনোভাবেরই ফলশ্রুতি।

ভূমিকা

মৃত্যু সার্বজনীনভাবে একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা বা প্রক্রিয়া। এটা জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। মৃত্যুর ভয়ে আমরা এটাকে যতই এড়িয়ে চলিনা কেন, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে ক্রমশঃ বার্ধক্য-প্রাপ্তি যেমন এক বাস্তবতা, তেমনি একটা পর্যায়ে মৃত্যুও এক চরম বাস্তবতা। তাই মৃত্যুকে এড়িয়ে না চলে এটা সম্পর্কে জানা এবং মৃত্যুর কথা ভেবে জীবনের বাকি সময়টাকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়ে জীবনকে অধিকতর অর্থবহ করে তোলা যেতে পারে এতে নিজের ও সমাজের অধিকতর প্রয়োজন মিটতে পারে।

* অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

থ্যানাটোলোজী (Thanatology) বা মৃত্যু বিষয়ক বিজ্ঞান (মৃত্যু-বিদ্যা) মৃত্যু ও মৃত্যু-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন করে। এই বিজ্ঞান মৃত্যুর জৈবিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, আইনগত এবং নৈতিক দিক সম্পর্কে কৌতূহল দেখায়।[১]

বর্তমান প্রবন্ধে আমি মৃত্যুর সামাজিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব। এ পর্যায়ে আমি মৃত্যুকে সজ্ঞায়িত করার সমস্যা, মৃত্যু ও সমাজকাঠামো, এবং মৃত্যুর প্রতি মনোভাব সম্পর্কে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

উল্লেখ্য, স্বাভাবিক মৃত্যুর উপরই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। হত্যা ও আত্মহত্যা জনিত মৃত্যুর আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে করা হয়নি।

মৃত্যুর সংজ্ঞা

মৃত্যু বলতে কি বোঝায়? মৃত্যুর সংজ্ঞা কি? চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মৃত্যুর সংজ্ঞাতে পরিবর্তন এসেছে। কোন ব্যক্তির হৃৎপিন্ডের স্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সে মৃত্যুবরণ করেছে-এটাই দীর্ঘদিনের ধারণা। এর সঙ্গে যদি মানব কোষ (cell) এবং টিস্যু (tissue) গুলো মরে যায় তবে মৃত্যুর আরও কিছু সংকেত সুস্পষ্ট হয়ে আসে। যেমন-চোখের প্রতিক্রিয়া থেমে যাওয়া, দেহের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া, রক্ত চলাচল থেমে যাওয়ায় শরীরের রং বদলে যাওয়া এবং মাংশ শক্ত হয়ে আসা। কারো মৃত্যু হয়েছে কিনা তা অদ্যাবধি এসব কিছু বিচার করেই স্থির করা হয়।

আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। ফলে যে সব রোগী কমায় (coma) চলে গিয়েছে এবং যাদের কোন brain wave activity নেই তাদের শ্বাস-জালি (respirator) এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃৎপিন্ডের স্পন্দন চালিয়ে রাখা যায় বিধায় মৃত্যুকে সনাক্ত করার ঐতিহ্যবাহী উপায়গুলো অপর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হচ্ছে। এ কারণেই-মৃত্যু সনাক্ত করার উপায় স্থির করতে মস্তিস্কের মৃত্যুর (brain death) উপর গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ২৪ ঘন্টা যাবৎ মস্তিস্কের কাজ বন্ধ থাকলে মস্তিস্কের মৃত্যু বা ব্রেইনডেথ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এটা electroencephalogram (EEG) থেকে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। এর সঙ্গে আরও যা দেখা হয় তা হল প্রতিক্রিয়াহীনতা, অনড় অবস্থা, শ্বাস-প্রশ্বাসহীনতা এবং চোখের প্রতিক্রিয়াহীনতা। কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তিস্কের বৃহত্তর অগ্রভাগের (cerebrum) ক্রিয়া বন্ধ হলে তাকে বলা হচ্ছে সেরিব্রাল ডেথ

(cerebral death)। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে মৃত্যুর কয়েকটি শর্ত হলঃ হৃৎপিন্ডের স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং মস্তিস্কের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া।[২]

তবে ব্রেনডেথ বা মস্তিস্কের মৃত্যু নির্ণয় করার সমস্যা দেখা দেয় কেবল মাত্র তখন যখন রোগীকে respirator বা শ্বাসজালির উপর রেখে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-ক্রিয়া চালানো সহ বাঁচিয়ে রাখার অন্যান্য প্রয়াস নেয়া হয়। তবে এ অবস্থায় ব্রেইন ডেথ সম্পর্কে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব (delemma) বা উভয় সংকট তৈরি হয় তা ডাক্তারকেই সামাল দিতে হয়। বস্তুতঃ উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রয়োগ আইন, নৈতিকতা, ধর্ম ইত্যাদি প্রশ্নগুলো এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে।

এক দেহ থেকে অন্য দেহে অঙ্গ প্রতিস্থাপন (organ transplantation) এর প্রযুক্তি ও কৌশল মৃত্যুর আধুনিক সংজ্ঞা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এমন লোকের দেহ থেকে অঙ্গ নেয়া হয় যার ব্রেনডেথ হয়েছে কিন্তু তার হৃৎপিন্ডের স্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ কৃত্রিমভাবে বজায় রাখা হয়েছে। অর্গান-ট্রান্সপ্লানটেশনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় স্থির করার প্রয়োজন দেখা দেয়ঃ মৃত্যু কখন হল তা স্থির করা; এবং মৃতের শরীর থেকে কখন তার অঙ্গ সরিয়ে নেয়া ঠিক হবে তা স্থির করা। এই দুটো বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ মৃত্যু কখন হচ্ছে বা হলো সেটা স্থির করার ক্ষেত্রে অদ্যাবধি দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে। বৃটিশ চিকিৎসা সাময়িকী *Lanchet* এর এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে শরীরে অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক জৈবিক কাজগুলো কৃত্রিমভাবে চালু রাখার জন্য যখন কোন রোগীকে অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির উপর সংস্থাপন করা হয তখন চিকিৎসা, আইন, নৈতিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় এক জটিল অবস্থার সূত্রপাত করে।[৩] এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে মৃত্যু কি একটি ঘটনা (event) নাকি এটা একটি প্রক্রিয়া (process)? প্রক্রিয়া হলে সে প্রক্রিয়ার শেষ কোথায়?

জাতিসংঘ কর্তৃক দেয়া মৃত্যুর সংজ্ঞা হলঃ কোন জীবের জন্মের পর যে কোন সময় তার জীবনের সব ধরণের সাক্ষ্য-প্রমাণের সম্পূর্ণ ও স্থায়ী অন্তর্ধান বা তিরোধান হচ্ছে মৃত্যু।[৪] সকল ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞার আলোকে মৃত্যু নির্ণয় করা হচ্ছে কি? বস্তুতঃ আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মৃত্যুর সংজ্ঞা চুড়ান্তভাবে স্থির করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।[৫]

সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক মৃত্যু

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একজন ব্যক্তির মৃত্যু না হলেও যদি তাকে সামাজিক ভাবে মৃত্যু মনে করে তার সঙ্গে তদানুযায়ী আচরণ করা হয় তবে তাকে বলা হয় সামাজিক মৃত্যু (Social death)। বস্তুতঃ সমাজের স্বাভাবিক কাজ কর্ম ও

অনুষ্ঠানাদিতে যদি কেউ যোগদান না করে, বা না করতে পারে, বা করতে দেয়া না হয় তখন তাকে সামাজিকভাবে মৃত্যু বলা যেতে পারে। যে ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখে সে-ই সামাজিকভাবে মৃত। পক্ষান্তরে; কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে মৃত মনে করে বা মৃতের ন্যায় ভাবে তবে তাকে (Psychological death) বা মনস্তাত্ত্বিক মৃত্যু বলা যায়।[৬] বস্তুতঃ ব্যক্তি যখন নিজকে নানা কারণে সমাজের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং একটা হীনমন্যতায় ভোগে, অভিমানী হয়ে উঠে তখন নিজকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মৃত বলে প্রত্যক্ষ করে। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি মনে মনে নিজের মৃত্যু ডেকে আনে। সে খুবই অবসাদ বা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।[৭]

মৃত্যু ও সমাজ কাঠামো

মৃত্যু এবং সমাজ কাঠামো একে অপরকে প্রভাবিত করে। যেহেতু মৃত্যু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন ঘটনা বা প্রক্রিয়া, যা যখন-তখন, জানতে-অজান্তে অহরহই ঘটে এবং যেহেতু মৃত্যুর ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা, পরিবার তথা সমাজ কাঠামো প্রায়শঃ সাময়িকভাবে হলেও হুমকির সম্মুখীন হয় সেহেতু প্রতিটা সমাজ বা সংস্কৃতিই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কিছু বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচার অনুষ্ঠান[৮] গড়ে তোলে। এসব বিশ্বাস, মূল্যবোধও নিজের ও অপরের মৃত্যুর প্রতি প্রতিক্রিয়া তথা মনোভাব তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বস্তুতঃ মৃত্যু সমাজ-কাঠামো এবং জীবিতদের জীবনকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। মৃত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুরুত্বানুসারে তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতিগোষ্ঠি, সমাজ, দেশ এমনকি বিশ্ব-সমাজ পর্যন্ত প্রভাবিত হতে পারে। বয়স, মৃত্যুর কারণ ও প্রকৃতি, পরিবার ও সমাজে তার সামগ্রিক প্রভাব বিচারে মৃতের আপনজন থেকে শুরু করে অনেকেই ব্যথিত হন, তার অভাব বোধ করেন এবং অপুরনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হন। উপার্জনক্ষম পিতা-মাতার মৃত্যুতে পরিবারের আয় কমে যায়। ক্ষমতাবান ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবারে প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। উচ্চ-মর্যাদাবানের মৃত্যুতে পরিবারের মর্যাদায় ভাঁটা পড়তে পারে। এভাবে মৃত্যু সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং সমাজ কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচনা করে।

কোন ব্যক্তির জীবন যাত্রার মান এবং জীবন ধারা (life style) যেমন তার আয় এবং সম্পদ দ্বারা অনেকখানি নির্ধারিত ও প্রভাবিত, তেমনি অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার মান এবং মৃত্যুধারাও (death style) আর্থিক উপাদান দ্বারা অনেকটা

নির্ধারিত ও প্রভাবিত। রোগের ধরণ-প্রকৃতিও শ্রেণীগত অবস্থান দ্বারা বেশ কিছুটা প্রভাবিত। একই রোগের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন-ঝাঁড় ফুঁক, মাদুলি, আয়ূর্বেদীক, হোমিওপ্যাথিক, আকুপাংচার, সম্মোহন পদ্ধতি, পাশ্চাত্যের আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ যেমন করেন, তেমনি বিভিন্ন মানের হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বিভিন্ন পর্যায়ের ডিগ্রীধারী চিকিৎসকের স্বরণাপন্ন হন। অতএব, এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে সমাজ কাঠামোয় ব্যাক্তির শ্রেণীগত অবস্থান তার চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মৃত্যুর পরিবেশকে বেশ খানিকটা প্রভাবিত করে।

মৃত্যু যেন অনেক পরিবারের কাছেই একটি আকশ্মিক ঝড় যা পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক তথা বন্ধনকে (যা সমাজ কাঠামোর একটি অপরিহার্য উপাদান)[৯] ভেঙ্গে তসনস করে দিতে চায় (এবং অনেক ক্ষেত্রে দেয়ও)। পারিবারিক তথা সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, যেমন মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মৃত্যু পরবর্তী ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, (যেমন মুসলিম সমাজে চেহলাম, চল্লিশা ইত্যাদি) শোক বা স্বরণসভা ইত্যাদি শোকাতুর ব্যক্তিদের সান্তনা প্রদানের মাধ্যমে হারানো সামাজিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। ফলে সমাজ কাঠামোয় সংগতি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ডুরখেইমও[১০] মৃত্যুতে পরিবার তথা সমাজকাঠামোর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সমাজ স্বীকৃত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব এবং পরিবারের জন্য তা পালন করার বাধ্যবাধকতা সর্ম্পকে আলোকপাত করেছেন।

পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো ও মৃত্যু

সরল প্রযুক্তি নির্ভর অনক্ষর সমাজে মৃত্যুহার ছিল সবচে' বেশি। সেখানে বছরে ১০০ দিনই কোন সমাজের মানুষকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ করতে হতো।[১১] প্রাক-শিল্প সামাজেও মৃত্যুহার ছিল বেশি। প্রত্যাশিত আয়ুও ছিল কম। আজকের তুলনায় তখন অল্প বয়সী লোকের বেশি মৃত্যু হত। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় ত্রয়োদশ-থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপীয় জীবনের প্রত্যাশিত আয়ু ছিল মাত্র বিশ থেকে চল্লিশ বছর।[১২] মধ্যযুগে মৃত্যুহার বেশি ছিল বলে মৃত্যুভীতি থাকলেও মৃত্যু ছিল সাধারণ নিত্যপরিচিত, নিত্যদিনের জীবনের অংশ।[১৩] মৃতের কবর বাড়ীর ওপর বা আশে পাশেই দেয়া হত। প্রাক-শিল্প সমাজে মৃত্যুহার বেশি থাকার কারণে প্রায়ই যেহেতু পরিবার ও সমাজ জীবনে অসংগতি ও ভারসাম্যহীনতা দেখা দিত সেজন্য সে যুগে অনু পরিবারের চেয়ে যৌথ পরিবার

কাঠামোকে গুরুত্ব দেয়া হত। শিশু মৃত্যুর হার বেশি থাকায় তখনকার মানুষ অধিক সন্তান জন্মদানের কথা ভাবতো। যেহেতু জন্মের দশ বছরের মধ্যে অর্ধেক পরিমান শিশু মারা যেত তাই কারও কারও সন্দেহ ছিল যে শিশুরা real people কিনা।[১৪]

প্রাক-শিল্প সমাজে যেহেতু মৃত্যু ছিল অনিয়ন্ত্রিত সেহেতু মৃত্যুর পর পারিবারিক ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান তৈরী করতে মৃত্যুর ধর্মীয় ও জাদুকরী ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়।[১৫]

উনবিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, উন্নত পয়ঃপ্রনালী এবং জনস্বাস্থ্য সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্বির ফলে মৃত্যুহার কমে আসে এবং মৃত্যু ক্রমশঃ শিশু ও যুব বয়সী থেকে বার্ধক্যে গিয়ে ভর করে। অর্থাৎ মৃত্যুর ঘটনা নবীনের তুলনায় প্রবীণের মধ্যেই বেশী ঘটতে থাকে।

আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে অধিকাংশ মৃত্যুই বাড়ীতে নয় বরং হাসপাতালে, নার্সিংহোম বা বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে সংঘটিত হয়। এর আগে কোন লোক নিজের বাড়ীতে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে তাদের সামনে মারা যেত। বর্তমানে আমেরিকান সমাজে ৬৬% মৃত্যুই বাড়ীর বাইরে হাসপাতাল, ক্লিনিক বা নার্সিংহোমে সংঘঠিত হচ্ছে।[১৬]

আজকের যুগে ইচ্ছা করলেই মৃত্যুর সময় পরিবার ও জ্ঞাতিজনরা সবাই সর্বদা উপস্থিত থাকতে পারেন না। আধুনিক সমাজে পেশায় বৈচিত্র এসেছে। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ স্বীয় পরিবার ও সমাজ ছেড়ে দূর-দূরান্তে নানা পেশায় নিয়োজিত। ফলে মৃত্যুতে পরিবারের সবাই উপস্থিত থাকতে পারেনা। প্রবীণের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিশু মৃত্যুর হার কমে আসা এবং যৌথ পরিবারের স্থলে অনুপরিবার গড়ে ওঠায় মৃত্যুর সময় বেশি লোক উপস্থিত থাকতে পারে না।[১৭]

বর্তমানে বাংলাদেশের নগর সমাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকই হাসপাতালে বা ক্লিনিকে মৃত্যুবরণ করছে। ইদানিং প্রাইভেট ক্লিনিক ও হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু গ্রামীন সচ্ছল ব্যক্তিদের মৃত্যুও নগরের হাসপাতালে সংঘটিত হচ্ছে। গত ২৫/৩০ বছরে বাংলাদেশের সমাজেও মৃত্যুর স্থান পরিবার থেকে হাসপাতালে পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে যারা রোগ-ভোগের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা মৃত্যুর অনেক আগেই পরিবার-পরিজন-বন্ধুবান্ধব থেকে

সামাজিকভাবে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। মৃত্যুর আগেই তারা সামাজিক গুরুত্ব হারাতে থাকেন। ঐ সমাজে যুব বয়সী অনেকেই মৃত্যু-আসন্ন রোগীদের থেকে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুরত্ব বজায় রাখেন।

আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে মৃত্যু অনেকটা অদৃশ্য এবং নৈর্ব্যক্তিক (invisible and impersonal) রূপ পরিগ্রহ করেছে। কেননা, মৃত্যুর সময় ডাক্তার ও নার্স ছাড়া সেখানে আর কারও যাবার অনুমতি নেই বললেই চলে। বস্তুত; হাসপাতালে ভর্তি থেকে শুরু করে, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, রোগীর অবস্থার অবনতি, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে রোগীকে হস্তান্তর, ইনসেনটিভ কেয়ার, মৃত্যু, ময়না তদন্ত, মৃত্যুর সনদপত্র, হাসপাতাল ত্যাগ একটি দীর্ঘ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা। মৃত্যুর আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রোগীর আপন জনদের কাছে থাকা প্রায় ক্ষেত্রেই নিষেধ। ফলে এটা নৈর্ব্যক্তিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

আধুনিক সমাজে মৃত্যুকে কেবল আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই আনা হয়নি, মৃত্যু সম্পর্কে এখন ক্রমশঃ সামাজিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে; কোন্ রোগের জন্য কোন্ হাসপাতাল সবচে' ভাল সেটা সহজে জানা যাচ্ছে; কোন্ রোগের কি পদ্ধতির চিকিৎসা এবং রোগীর আত্মীয় স্বজনের কি করণীয় তা অনেকেরই জানা। ফলে, কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে আগের মত সমাজের সবাইকে ব্যতিব্যস্ত না করে এম্বুলেন্স পাঠাতে একটা ফোনই যথেষ্ট। বড় জোর নিজ পরিবার সদস্যরা কাউকে হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর যা করণীয় তাতো হাসপাতালের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই রয়েছে যা প্রধানত নৈর্ব্যক্তিক ও অদৃশ্যমান।

মৃত্যুর আমলাতান্ত্রিক ও ব্যক্তিগতকরণ (bureaucratization and privatization) প্রক্রিয়ার ফলে আধুনিক শিল্প সমাজে-মৃত্যু গোটা সমাজকে পূর্বের ন্যায় ততটা নাড়া দেয় না বটে তবে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দেয়; ব্যক্তির ওপর মানসিক চাপ পড়ে।[১৮] কেননা, রোগী হাসপাতালে যাবার পরই পরিবার ও সমাজ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং তিনি তখন একা অসহায় বোধ করেন; মৃত্যুকে বুঝতে এবং মৃত্যুকে মেনে নিতে অধিকতর কষ্ট পান। তাঁর মৃত্যু তাকেই সামাল দিতে হয়। আপন বলতে কেউ তাঁর কাছে থাকে না।

উপরোক্ত কারণেই ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডায় মুমূর্ষ বা মৃত্যু আসন্ন রোগীর (Terminally ill patient) জন্য বিশেষ সেবাদান কেন্দ্র হসপাইস (Hospice) গড়ে উঠছে যা হাসপাতাল ও বাড়ীতে মৃত্যুর সুবিধে-অসুবিধের

বিতর্কের একটা সমঝোতার ফলশ্রুতি (পরে দেখুন)।

মৃত্যুর প্রতি মনোভাব

মৃত্যুর প্রতি মনোভাব সর্ম্পকে জানা এবং এ বিষয় নিয়ে গবেষনার ক্ষেত্রে কতিপয় সমস্যা রয়েছে। মৃত্যুর প্রতি মনোভাব বেশ জটিল এবং তা পরিবর্তনশীল। এটা বয়স, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ, ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর যেমন নির্ভর করে তেমনি নির্ভর করে পরিবেশ-পরিস্থিতি, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল এবং কোন্ ধরণের মৃত্যু, কার মৃত্যু সে সবের ওপর। তদুপরি, মৃত্যুর প্রতি মনোভাবে পরিবর্তন আসতে পারে। বিষয়টি আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারও বটে। বিষয়টি প্রধানত; সামাজিক-মনস্তাত্বিক এবং তা বেশ জটিল এবং অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য। মৃত্যুর প্রতি মনোভাব জরিপ করতে গিয়ে যে উত্তর পাওয়া যায় তাতে উত্তর দাতার মনোভাব কতটা সঠিকভাবে ধরা পড়ে সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন, একজন উত্তর দাতা বললেন, তিনি মৃত্যুকে খুব কমই ভয় পান এবং নিজের মৃত্যু সর্ম্পকে কদাচিৎ ভাবেন। এ ধরণের উত্তরে বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে তিনি মৃত্যুকে সহজে নিয়েছেন এবং মৃত্যু সর্ম্পকে তেমন নেতিবাচক বা ভয়ভীতিমূলক মনোভাব পোষন করেন না। কিন্তু এমনও হতে পারে মৃত্যুকে তিনি মূলতঃ ভয় পান এবং তাই বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চান বলেই কথা না বাড়িয়ে সহজে ঐভাবে উত্তর দিয়েছেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় মৃত্যু নিয়ে গবেষণা খুব বেশি দিনের নয়। ইতোমধ্যে যে সব গবেষণা হয়েছে তাতে মৃত্যুর প্রতি কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থী, মেডিক্যাল ষ্টাফ, রোগী ইত্যাদি লোকের মনোভাবই গবেষণা করা হয়েছে। ব্যাপকভাবে সমাজের সর্বস্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তেমন গবেষণা হয়নি।

প্রবন্ধের এই অংশে আমেরিকান সমাজে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল এবং বাংলাদেশে পরিচালিত আমার একটি গবেষণার ফলকে কাজে লাগিয়ে মৃত্যুর প্রতি মনোভাবের একটি সাধারণ চিত্র দেয়ার চেষ্ঠা করব।

মৃত্যুভীতি এবং তা' এড়ানো এবং অস্বীকার

মৃত্যুভীতির দুটো ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি ব্যাখ্যায় বলা হয় মৃত্যুভীতি শিক্ষণের ফল। অর্থাৎ মানুষ অন্যের মধ্যে মৃত্যুভীতি দেখে নিজের মধ্যে মৃত্যুভীতি জাগিয়ে তোলে। এটা না দেখলে সে হয়ত মৃত্যুভীতি সর্ম্পকে জানতেই পারত না এবং তা শিখতে পারত না ("fear of death is learned and can be unlearned")। আরেকটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মৃত্যুভীতি মানব অস্তিত্বের স্বাভাবিক পরিণতি বা স্বাভাবিক মানবীয় প্রতিক্রিয়া এবং তা (মৃত্যু ভীতি)

পরিবর্তন বা দূরও করা সম্ভব নয় ("fear of death is natural part of human condition and cannot be changed")। মানব জীবনে মৃত্যুভীতি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেটাকে মোকাবেলা করতে মানুষ অনেক আচার-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি গড়ে তুলেছে।[১৯]

সব সমাজেই অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুকে কম-বেশি ভয় পান। মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার এবং এড়িয়ে চলার আচরণটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশনে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে। যেমন-He/she has died না বলে আমেরিকান সমাজে সাধারণতঃ বলা হয় He expired; she passed away; he is no longer with us ইত্যাদি। আমাদের সমাজেও মারা গিয়েছেন বা মৃত্যুবরণ করেছেন না বলে অনেকেই বলেন-পরলোকগমন করেছেন; ইহলোক ত্যাগ করেছেন, বাবা-মাকে হারিয়েছেন, তিনি আর আমাদের মাঝে নেই, এ ধরাধাম ত্যাগ করেছেন-চির নিদ্রায় শায়িত, চিরবিদায় নিয়েছেন ইত্যাদি।

শিল্পায়িত উন্নত সমাজে মৃত্যু সংবাদ পাবার পর যে সব কার্ড পাঠিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করা হয় তাতেও নানা ধরনের রুপক (Metaphor) শব্দ/ভাষা ব্যবহার করা হয় যেখানে Death শব্দটি তেমন সরাসরি ব্যবহৃত হয়না। আমেরিকান সমাজে পরিচালিত একটি গবেষণায় দুইশ sympathy card এর মধ্যে মাত্র ৬টিতে Death শব্দটি পাওয়া গিয়াছে।[২০] আমাদের সমাজেও মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে কেউ কেউ রুপক শব্দ/ভাষা প্রয়োগে সমবেদনা জানিয়ে থাকেন। অতএব দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন এবং সমবেদনা প্রকাশের চিঠি বা কার্ডের ভাষার মধ্যে মৃত্যুভীতি এবং মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার একটা সচেতন প্রয়াস রয়েছে। আমেরিকান সমাজের অনেকেই কাছেই মৃত্যু নিয়ে কথাবার্তা একটি ট্যাবু (Taboo)বা নিষিদ্ধ বিষয় বিশেষ। আমাদের সমাজে অধিকাংশ লোকই অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মৃত্যুসংবাদ জানাতে চান না বা তাদেরকে মরদেহ দেখাতে চাননা ।

'মৃত্যুতেই শেষ' অথবা 'মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যাক' এটাও অনেকেই মেনে নিতে চাননা। প্রায় সবার মধ্যেই কম-বেশী অমরত্ব লাভের একটা চেষ্টা থাকে। উত্তরসূরী সন্তানের নামের সঙ্গে নিজের নাম যোগ করে; তাদের মাঝে অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গিয়ে; আত্মজীবনী লিখে; গবেষণা কর্ম প্রকাশ করে; কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বা সমাজ সেবা করে নিজেকে অমর করে রাখতে চান/রাখেন। এ ধরণের প্রয়াসের মাঝে অবচেতন বা চেতন মনে মৃত্যুকে এড়ানো, মৃত্যুকে জয় করা, মৃত্যুতে যেন সব শেষ নয় এমন মনোভাব প্রকাশ পায়।[২১]

মৃত্যুভীতির কারণ

মৃত্যুভীতির কারণ অনুসন্ধানে বেশকিছু গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে।[২২] এসব গবেষণা কর্মে মৃত্যুভীতির যে সব কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলোঃ মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মরদেহের পরিণতি সর্ম্পকে দুশ্চিন্তা; মৃত্যুর ফলে জীবনের সব লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্থ হবার দুশ্চিন্তা; মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরী সন্তান সন্ততি ও তার উপর এতদিন নির্ভরশীলদের কি হবে সেটা নিয়ে দূর্ভাবনা; ধর্মবিশ্বাসীদের ধর্ম পালনে গাফলতির জন্য পারলৌকিক শাস্তির ভয়, এই সুন্দর পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকা যাবেনা, আগামীদিনে এ সভ্যতার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন হবে তা দেখা ও ভোগ করা যাবেনা- ইত্যাদি কারণে মানব মনে মৃত্যুভীতি জাগে।

অবশ্য সবার কাছে সব কারণ একই মাত্রায় গুরুত্ব বহন করেনা। যেমন, কেউ হয়ত মৃত্যুযন্ত্রণা, মরদেহের পরিনতি সর্ম্পকে বেশি চিন্তা করেন; কেওবা জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারবেন না ভেবে বেশি দুশ্চিন্তা করেন; কেওবা তার উপর নির্ভরশীলদের কি হবে সেটাই বেশি ভাবেন।

বার্ধক্য ও মৃত্যু

যদিও বার্ধক্য ও মৃত্যু এক নয় এবং বার্ধক্য মৃত্যুর কোন কারণও নয় তথাপি মানুষ মনে করে মৃত্যু এমন এক ঘটনা যা বাধ্যক্যেই বেশি ঘটে। এর কারণ প্রধানতঃ দুটি। শিশু মৃত্যুর হার কমে যাওয়া এবং সংক্রামক ব্যধি যেমন-যক্ষা, টাইফয়েড, সিফিলিস, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি দমন করা সম্ভব হয়েছে এবং মানুষ এখন এমন সব রোগে মারা যাচ্ছে যা বার্ধক্যেই বেশি দেখা যায়। যেমন- হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

প্রবীণদের মধ্যে মৃত্যু ভীতি কি বেশি?

অনেকেই মনে করেন যেহেতু গড় পরতা হিসাবে তুলনামূলকভাবে প্রবীণের আয়ু উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে আসে; এবং তাঁরা মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যান সেহেতু তাঁদের মৃত্যুভীতি অন্যান্যদের তুলনায় বেশি। এ সর্ম্পকে ইউরোপ-আমেরিকায় পরিচালিত গবেষনায় বিপরীত অবস্থাই আবিস্কৃত হয়েছে। একটি গবেষনায় দেখা গিয়েছে মাঝ বয়সীদের (৪৫-৫৪ বছর) মধ্যে মৃত্যুভীতি সবচেয়ে বেশি। পক্ষান্তরে প্রবীণরা (৬৫-৭৪ বছর) সবচেয়ে কম মৃত্যুভীতির কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ গবেষণায় এটাই দেখা গিয়েছে যে, বার্ধক্য-প্রাপ্তির সাথে সাথে মৃত্যুভীতি হ্রাস পায়।[২৩]

প্রবীণদের মৃত্যুভীতি কম থাকার কারণ কি? প্রথমতঃ প্রবীণরা তাঁদের জীবনের মূল্য কম দেন। কেননা তারা মনে করেন যে তাঁদের ভবিষ্যৎ খুবই সীমিত এবং নির্দিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ বার্ধক্যে পৌঁছে তাঁরা মনে করেন- 'অনেকদিনতো বাচঁলাম সামনের দিনগুলোতো অতিরিক্ত বা বোনাস হিসাবেই পাওয়া; বোনাস সময়ে কিই বা করার আছে?' তৃতীয়তঃ মানুষ যতই বৃদ্ধ হয় ততই তাঁরা অধিক সংখ্যায় অন্যান্যদের মৃত্যু পর্যবেক্ষণ করেন। ফলে,অন্যান্যদের মৃত্যু দেখে শান্ত, ধির-স্থির এবং একাকিত্ব বোধ করেন এবং নিজের মৃত্যুকে ক্রমশঃ সহজে ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শুরু করেন।[২৪]

তবে যদিও প্রবীণরা মৃত্যুকে তুলনামূলকভাবে কম ভয় পান তথাপি তারাই মৃত্যু নিয়ে বেশি ভাবেন এবং মৃত্যু নিয়ে অন্যান্যদের চেয়ে বেশি কথা বলেন। অধিকাংশ প্রবীণের কাছে মৃত্যু একটি প্রায়শঃ গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। তাঁদের নিজেদের মৃত্যু আসন্ন বলেই যে কেবল মৃত্যু নিয়ে কথা বলেন তাই নয়, মৃত্যু সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার ভান্ডারও তাঁদের বেশ বড়। কেননা বার্ধক্যে পৌঁছার পথ-পরিক্রমায় তাঁরা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অনেকের মৃত্যুই দেখেছেন।[২৫]

একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে পুরুষের তুলনায় মহিলারা মৃত্যু-যন্ত্রণা নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করেন। পক্ষান্তরে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষেরা তাদের জীবনের পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন। অবিবাহিত ব্যক্তির তুলনায় বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের উপর নির্ভরশীলদের ভবিষ্যৎ ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়েন।[২৬]

কারও জীবনে মৃত্যু কতটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা - এ বিষয়ের উপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে ৮৯% উত্তর দাতা বলেছেন যে মৃত্যু কখনও বা আর্শীবাদ; ৮২% এর মতে মৃত্যু কেবল মৃতের আপন জনের কাছেই বেদনাদায়ক ঘটনা; ৫৩% এর মতে মৃত্যু সর্বদাই দ্রুত এসে হাজির হয়; ১৪% এর মতে মৃত্যু অর্থ দুঃখ-কষ্ট। শতকরা ৮০ জনের মতে মৃত্যুকে অবহেলা বা অস্বীকার না করে মৃত্যুর ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করাই উত্তম। এ জন্যই ৭০% উত্তরদাতা জীবন বীমা করেছেন; ৫০% উত্তরদাতা অন্যের সঙ্গে মৃত্যু সর্ম্পকে আলোচনা করেছেন এবং ২৫% জীবদ্দশায়ই তাদের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করেছেন এবং সম্পত্তির উইল তৈরী করে রেখেছেন।[২৭]

মৃত্যুকে কতটা ভয় পান- এ প্রশ্নের উত্তরে ৪৫ থেকে ৭৪ বছর বয়সী আমেরিকান উত্তরদাতাদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বলেছেন আদৌ না; এক তৃতীয়াংশ বলেছেন কিছুটা এবং কেবল ৪% জন বলেছেন খুবই ভয় পান।[২৮]

যারা মৃত্যুকে সচেতন মনে ভয় পান না তাঁদের অনেকেরই অবচেতন মনে মৃত্যুভীতি বাসা বাধে। এর ফলে অন্যান্য উপসর্গ, যেমন অনিদ্রা, ক্ষুধামন্দা, কাজে অনাগ্রহ (বা অনীহা) অন্যের মঙ্গল চিন্তায় অত্যধিক আগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে মৃত্যুভীতি অপ্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায়।[২৯]

মৃত্যুকে অস্বীকার করার পাশাপাশি এটাকে বাস্তব ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মনোবৃত্তি তৈরী হবার কারণ কি? এর কারণ মৃত্যুকে একদিকে যেমন সার্বজনীন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বলে আমরা বিশ্বাস করি (তাই এটাকে স্বাভাবিক মনে করতে হয়) অন্যদিকে নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতে পারিনা (তাই মৃত্যু ও মৃত্যু অস্বীকার)। অতএব, অন্যের মৃত্যু ও নিজের মৃত্যু সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মনোভাব ব্যক্ত হয়। আমেরিকায় পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যারা অধিক মাত্রায় ধর্মপরায়ন তাদের মধ্যে মৃত্যুভীতি কম। তবে যারা ধর্মে বিশ্বাসী নন তাদের মধ্যেও মৃত্যুভীতি কম।[৩০]

মৃত্যুর প্রতি মুমূর্ষ বা মরণাপন্ন রোগীর মনোভাব

মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ কুবলার রস (kubler Ross)। মুমূর্ষু রোগী (terminally ill patients)। দের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখতে পান যে তাদের প্রতি ডাক্তার, নার্স, পরিবার সদস্য এবং শুভাকাংঙ্খীরা যদি আরও যত্নশীল ও আন্তরিক হন এবং রোগীদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সহচার্যে আসেন এবং তাদের আস্থা অর্জন করে রোগীদের দুঃখ কষ্ট-বেদনার কথা শুনেন তবে রোগীরা বেশ আরামবোধ করেন এবং রোগীদের থেকে ডাক্তার ও নার্সদের অনেক কিছু জানবার ও শিখবার আছে। যে সব রোগী মৃত্যু শয্যায় শায়িত, অর্থাৎ মৃত্যু-আসন্ন রোগীরা মৃত্যুর প্রতি পাঁচ ধরণের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কুবলার রস মৃত্যুর প্রতি সংকটাপন্ন রোগীদের অভিব্যক্তি প্রকাশের একটা পর্যায়ক্রমিক মডেল দাড় করেছেন যা হয়ত সবার ক্ষেত্রে না হোক অনেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[৩১]

১ম পর্যায় ঃ মৃত্যু অস্বীকার (denial)

প্রথম পর্যায়ে সংকটাপন্ন রোগীরা মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চান। না, আমি না (No, not me)। 'আমি মরতে চাইনা, আমি মরব না' । এ ধরনের মনোভাব পোষন করেন। এ পর্যায়ে রোগী মনে করেন X-ray রিপোর্ট নির্ভর যোগ্য নয়। চিকিৎসার কোথাও হয়ত ভুল হয়েছে। তাই ডাক্তার/ও হাসপাতাল পরিবর্তন করা থেকে শুরু করে চিকিৎসার বিকল্প পদ্ধতির (যেমন হোমিও আয়ূবের্দিক ইত্যাদি) আশ্রয় নিতে পারেন।

২য় পর্যায় ঃ মৃত্যুর প্রতি রাগ ও রোষ (anger) •

এ পর্যায়ে রোগী মৃত্যুকে যদিও অস্বীকার করেননা তথাপি তিনি ভীষণ চটে যান। 'আমি কেন? (Why me?), আমি কেন মারা যাব? আমাকে কোন মরতে হবে? পরিবার, বন্ধু বান্ধব, মেডিকেল ষ্টাফ সবার প্রতি এই রোষ প্রকাশ পায়। ডাক্তার নির্দয়, নার্স ভুল করেছে পরিবার সদস্যরা মায়া মমতা হারিয়ে ফেলেছে ইত্যকার অভিযোগ-অভিমান রাগ-রোষ প্রকাশ পায়।

তৃতীয় পর্যায় ঃ মৃত্যুর সঙ্গে দর কষাকষি ও সন্ধিচুক্তি(bargaining)

এ পর্যায়ে-রোগী বুঝতে পারেন যে মৃত্যুকে অস্বীকার বা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; এবং মৃত্যুর প্রতি রাগ-রোষ প্রকাশ করেও লাভ নেই। তখন তিনি ভাবেন "হ্যাঁ, আমাকে করতে হবে, কিন্তু" (yes me, but...) 'কিন্তু এখনই মরতে হবে কেন?' তখন তিনি বিশ্বাসী হলে তার স্রষ্টা বা ইশ্বরের সঙ্গে মানসিক বৈঠকে অবতীর্ন হন এবং আরও কিছুদিন বাঁচার আশা প্রকাশ করেন। বাঁচার ইচ্ছা জাগে। কেউবা এ পর্যায়ে ভাল কাজ যেমন সমাজ কল্যাণ, সমাজ সেবা বা ইশ্বরের সমীপে নিজকে নিবেদন করা, ধর্মীয় কাজে মনোনিবেশ করা ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা করেন এবং তার বিনিময়ে এবং সে কাজের জন্য আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চান।

চতুর্থ পর্যায়ঃ অবসাদ বা উদ্যমহীনতা (depression)

এ পর্যায়ে রোগী হতাশ ও উদ্যমহীন হয়ে পড়েন "হায় আমি" ("woe is me")। 'আমার মৃত্যু হবে'। এ পর্যায়ে তিনি পরিবার, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন থেকে বিদায় নেন- তাদের কাছে দুঃখ ও অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। অন্যান্যদের কাছ থেকে রোগী নিজকে পৃথক করার ও চিরবিদায় নেবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের চেষ্টা করেন।

শেষ পর্যায় ঃ মেনে নেয়া (acceptance)

শেষ পর্যায়ে রোগী মনে করেন "এখন আমার যাবার সময়" (" It is time for me to go")। এ সময় রোগীর কোন রাগ-রোষ থাকেনা, থাকেনা হতাশা বা অবসাদগ্রস্থতা। বস্তুত; এ পর্যায়ে রোগীর তেমন কোন অনুভূতি থাকেনা। তখন তিনি হয়ত নীরবে মৃত্যুর আগমন কামনা করেন বা মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকেন।

মৃত্যুর প্রতি মুমূর্ষু রোগীর পর্যায় ক্রমিক মনোভাব সর্ম্পকে কুবলার রসের তত্ত্বটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষন করেছে এবং তা অনেকেই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ

করেছেন। এতদসত্বেও তার তত্ত্বের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে প্রত্যেক রোগীই যে কুবলার-রস নির্দেশিত পাঁচটি পর্যায় অতিক্রম করবে এমন নয়। কেউবা মনে করেন মৃত্যুর প্রক্রিয়ায় তেমন কোন পর্যায় বলতে কিছু নেই। একজন গবেষকের (kastenbaum) মতে কুবলার রসের তত্ত্বে প্রত্যয় ও পদ্ধতিগত দুর্বলতা রয়েছে। কোন ধরণের রোগী, তার চিকিৎসা পদ্ধতি কি তার জীবন ধারা কি, তার জাতিগত পরিচয়-এসব বিচার করা প্রয়োজন।[৬] তবে এটাও ঠিক কুবলার-রস প্রদত্ত তত্ত্বটি একটা মডেল অথবা অনুমান বা কল্পনা হিসাবে নিয়ে মৃত্যুর প্রতি বিশেষ বিশেষ রোগীর মনোভাব সম্পর্কে গবেষণা হতে পারে।

মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা মস্করা

অধিকাংশের কাছে যদিও বিষয়টি দুঃখ জনক ও আপত্তিকর তথাপি মৃত্যুর প্রতি মনোভাব প্রকাশের আরেকটি দিক হলো মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করা। মৃতের আত্মাকে চরিত্র বানিয়ে রসাত্মক বা বিদ্রুপাত্মক গল্প তৈরী হয়।

জীবন-বর্ধক প্রযুক্তি ও মৃত্যুর প্রতি পরিবর্তনশীল মনোভাব

চিকিৎসা প্রযুক্তির উন্নতির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর ফলে মরনাপন্ন রোগীকে দীর্ঘ সময় বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে। জীবন-বর্ধনে সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে মৃত্যু এবং মৃত্যু-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত মনোভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসছে এবং একই সাথে মৃত্যু সম্পর্কে নতুন নতুন জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে।

অনেকে জীবন বর্ধনকারী চিকিৎসা প্রযুক্তিকে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য হিসাবে গ্রহন করছে (A godsend that extends life)। অনেকে আবার মনে করছেন এই প্রযুক্তি মৃত্যুকে বিলম্বিত করছে যা হয়ত কাঙ্খিত নয়। প্রশ্ন উঠেছে মানব দেহের জৈবিক ক্রিয়া (যেমন কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃদযন্ত্রের কম্পন) বজায় রাখতে আমরা জীবন রক্ষাকারী প্রযুক্তির ওপর কি মাত্রায় কতটা নির্ভর করব? কৃত্রিমভাবে জীবন বর্ধনকারী প্রযুক্তির জন্য ব্যক্তি এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানকে কতটা আর্থিক ও অন্যান্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়? এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কে সিদ্ধান্ত নেবেন? ডাক্তার? রোগী? রোগীর আত্মীয় স্বজন? নাকি সমাজ? বস্তুত; জীবন বর্ধনকারী চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মৃত্যুর সংজ্ঞাতেও পরিবর্তন এসেছে। কারণ, আজকাল সঠিক প্রযুক্তির সাহায্যে মৃত্যু নামক ঘটনাকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত রাখা সম্ভব। তাই মৃত্যুর প্রতি অনেকের মনোভাবই চিকিৎসা প্রযুক্তির সফলতা ও ব্যর্থতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বস্তুতঃ একজন ব্যক্তিকে

যতদিন সম্ভব জীবন্ত রাখা সম্ভব তাকে ততোদিন জীবন্ত রাখাইতো চিকিৎসা নীতির ঐতিহ্য।

দু'টি বিতর্কিত বিষয় এবং সে বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্টদের মনোভাব ঃ

এক. রোগের গতির পূর্বাভাস জানার অধিকার **(right to know the medical prognosis)**

মুমূর্ষু বা সংকটাপন্ন রোগীর অবস্থা নির্ধারণ করেন চিকিৎসক, রোগীর পরিবার-পরিজন এবং রোগী নিজে। মৃত্যু আসন্ন রোগীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে চার ধরণের সচেতনতা-অবস্থা (awareness situation) চিহ্নিত করা যায়। প্রথমে এমন একটি অবস্থার উদ্ভব ঘটতে পারে (এবং ঘটে) যে অবস্থায় রোগী জানে না যে সে শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় প্রায় ক্ষেত্রেই চিকিৎসক চান না রোগী তার প্রকৃত অবস্থা জানুক। রোগীর মনোবল যাতে ভেঙ্গে না যায়-এটাই চিকিৎসকের প্রধান যুক্তি। তাছাড়া রোগী তার প্রকৃত অবস্থা জেনে ফেললে সে অতিমাত্রায় চঞ্চল ও ধৈর্যহারা হয়ে উঠতে পারে যাকে সামাল দেয়া ডাক্তার ও নার্সের জন্য হতে পারে খুবই কষ্টকর কাজ। নার্সকে বলা থাকে গোপনীয়তা রক্ষা করতে যা তার আচরণকে করে তোলে স্ববিরোধপূর্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে অস্বস্থিকর। অন্যদিকে এ অবস্থা রোগীর পরিবারের জানা থাকলে তাদের জন্যও ভীষণ কষ্ট ও বেদনাদায়ক হয়। নার্সদের মত তাদেরকেও রোগীর সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বে অভিনয় করতে হয় যা খুবই অস্বস্থিকর ও অমানবিক বলে মনে হতে পারে।[৩৩]

কতিপয় গবেষকের মতে[৩৪] মৃত্যুর প্রক্রিয়া সর্ম্পকে রোগীর সচেতনতার এই সমস্যাটি কেবল টেকনিক্যাল নয়। এটা নৈতিক ব্যাপারও বটে। কেননা, কোন বিশেষ মৃত্যুপথযাত্রী রোগী তার আসন্ন মৃত্যু সর্ম্পকে জানতে পারলে তিনি হয়ত তার কিছু অতীব প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতে পারতেন। যেমন-বিশ্বাসী ব্যক্তি তার স্রষ্টা বা ঈশ্বরের কাছে তার অন্তিম অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারতেন। সহায় সম্পত্তিসহ অন্যান্য প্রসঙ্গে করণীয় কাজ গুলো করে ফেলতে পারতেন। পরিবারকে আরও কিছু দেয়ার থাকলে দিতে পারতেন। এমনকি, তিনি যেমন ভাবে জীবন যাপনের ধারাকে (style of living) নিয়ন্ত্রন করে এসেছেন তেমনিভাবে তিনি তার মরণ ধারা (style of dying) ও নিয়ন্ত্রন করতে চাইতে পারতেন। এ জাতীয় বিষয় উত্থাপন করে গবেষকবৃন্দ প্রশ্ন তুলেছেনঃ মৃত পথযাত্রী রোগীকে তার আসন্ন মৃত্যু-বার্তা জানা থেকে বঞ্চিত করা এবং তার

অন্তিম জরুরী কাজগুলো করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার কারও (চিকিৎসকসহ) অধিকার আছে কি?[৩৫]

১৯৭০ এর দশকেও শিকাগো হাসপাতালের ৯০% চিকিৎসক রোগীকে তার সংকটাপন্ন অবস্থা বা আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই বলতেন না। ইদানিং আমেরিকান সমাজে এ অবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। রোগীকে তার প্রকৃত অবস্থা এবং আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে বললে বরং রোগী তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে অধিক সহযোগিতা দান ও নিজের প্রতি আরও যত্নশীল হন। আর এটাই অধিকতর সঠিক পন্থা বলে বিবেচিত হচ্ছে। তবে আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ জানলে কোন কোন রোগীর মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে পারে।[৩৬] তাই, বিষয়টি সম্পর্কে আরও ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে।

দুইঃ মৃত্যুবরণ করার অধিকারঃ (right to die)

মরণাপন্ন রোগীর ব্যথা-বেদনা, কষ্ট ও ভোগান্তি যদি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে অথবা গভীরভাবে অসচেতন বা সংজ্ঞাহীন (in coma) রোগীর মৃত্যুকে যান্ত্রিক উপায়ে বিলম্বিত করা হতে থাকে তবে এক পর্যায়ে প্রশ্ন ওঠে ঐ রোগীর জীবনকে আর কদিন রক্ষা করা উচিৎ?

মৃত্যু-পথযাত্রী রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে মাত্র তিনটি সম্ভাব্য পথ খোলা থাকেঃ

এক. রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সম্ভব সব ধরণের উপায় অবলম্বন করা;

দুই. বাঁচিয়ে রাখার কৃত্রিম বা বীরোচিত পন্থা (artificial or heroic measures) পরিত্যাগ করা (discontinue); তবে সাধারন চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া; এবং

তিন. মৃত্যুকে দ্রুত ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।[৩৭]

বাঁচিয়ে রাখার কৃত্রিম তথা বীরোচিত কৌশল ত্যাগ করে সাধারণ চিকিৎসা চালিয়ে যাবার পক্ষে অধিকাংশ লোকই মত দেন। তবে মৃত্যুকে দ্রুত ত্বরান্বিত করতে কোন কৌশল গ্রহণের ব্যাপারে অনেকেরই আপত্তি আছে। সংকটাপন্ন রোগীকে মৃত্যুবরণ করার অনুমতি (euthanasia)[৩৮] দেয়া যায় কি? অনুমতি দেওয়া আর হত্যা করার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? চিকিৎসা বন্ধ করা এবং শুরু না করার মধ্যে পার্থক্য কি? চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করার রোগীর অধিকার আছে কি? ইউরোপ ও আমেরিকান সমাজে অনেকেই মনে করেন মৃত্যুবরণ করার অনুমতি দেয়া যেতে

পারে তাদেরকে যারা খুবই অসুস্থ, মরণাপন্ন অবস্থা, (terminally ill) এবং চিকিৎসক যখন তার ব্যাপারে হতাশ হন। ঐ সব সমাজে এমন প্রবীণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যারা বার্ধক্যে মরণাপন্ন অবস্থায় (terminally ill) দীর্ঘ সময় কাটান। ঐ সমাজে সক্ষম অথবা যারা উপকার পাবে এমন প্রবীণদের বার্ধক্যে মরণাপন্ন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখতে কৃত্রিম যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যের ক্ষতি না করে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ দেহকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে যা আগামীতে একটা আইনগত অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে।

মৃত্যু কি প্রাকৃতিক- বা স্বাভাবিক? মৃত্যুকে অনেক সমাজেই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক মনে করা হতো। জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিই মৃত্যু। মৃত্যুকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে জীবনকেই যেন অস্বীকার করা । বর্তমানে পাশ্চাত্যের উন্নত হাসপাতালে মৃত্যুকে অপ্রাকৃতিক অস্বাভাবিক মনে করে এটার বিরুদ্ধে বিরোচিত যুদ্ধ করা হচ্ছে।

হসপাইস (Hospice)

টারমিন্যালী ইল (terminally ill) রোগীদের বিশেষ সেবাযত্ন কেন্দ্রের নামই হসপাইস। এটা কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিক নয়। তবে হাসপাতালের একটি বিশেষ ইউনিটও হতে পারে। আলাদাভাবে হসপাইস গড়ে উঠতেও পারে। এমনকি পারিবারিকভাবেও হসপাইস গড়ে ওঠা সম্ভব। প্রথম দিকে হসপাইস বলতে, ভ্রমনকারীদের জন্য পান্থশালা (way-station for traveler) বুঝাতো। ১৯৫০ এর দশকে ইংল্যান্ড এবং ১৯৭৬ সাল থেকে আমেরিকায় সর্ব প্রথম হসপাইস ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এটা কানাডায়ও বিস্তার লাভ করেছে।

হসপাইস মূলতঃ মৃত-পথযাত্রী রোগী বা মৃত্যু-আসন্ন রোগীদের বিশেষ সেবাদানের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। হাসপাতাল রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসার ওপর জোর দেয়। পক্ষান্তরে, হসপাইস জোর দেয় সেবা-যত্নের ওপর। হসপাইসের প্রধান উদ্দেশ্য দৈহিক ও মানসিক দুঃখ কষ্ট ও বেদনা লাঘব। এজন্য রোগীকে বেদন-নাশক ড্রাগ প্রয়োগ করা হয় এবং রোগীর সঙ্গে খুবই আন্তরিক ও মানবিক আচরণ করা হয়। সে সঙ্গে রোগীর মানসিক যত্ন এবং ধর্মীয় পরামর্শ প্রদানেরও ব্যবস্থা নেয়া হয়।[৩৯]

হসপাইসে পরিবার পরিজন রোগীর কাছে থাকতে পারেন। তারা থাকতে চাইলে স্বাগত জানানো হয়। হসপাইসের অন্যতম লক্ষ্য জীবন সাহাহ্নের শেষ দিনগুলি যেন মৃত্যু-প্রক্রিয়ার কষ্টের মধ্যে না কেটে বাচাঁর প্রক্রিয়ার মধ্যেই কাটে।[৪০]

মৃত্যু-আসন্ন একজন ব্যক্তি কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? ইউরোপ আমেরিকার মত সমাজে অধিকাংশ লোক এখন হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করে। অবশ্য অনেকে এখনও নিজের বাড়ীতে পরিবার পরিজনের মাঝে মরতে চান। হাসপাতাল ও পরিবারের মাঝে সমঝোতার ফলই হসপাইস।[৪১]

হসপাইস হচ্ছে আরাম দায়ক, সুখকর, প্রানবন্ত এবং সুন্দর-পরিচ্ছন্ন রঙ্গিন পরিবেশ যেখানে মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার কৃত্রিম যন্ত্রপাতি নেই। তবে রোগীর অন্যসব প্রয়োজনের দিকে নজর দেয়া হয়। হসপাইসে রোগীকে বেদনা নাশক ড্রাগ দেওয়া হয়। তবে অজ্ঞান (anesthesia) করা হয়না। রোগীকে আরামে এবং সচেতন রাখা হয়। সেবাযত্ন ও ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বাধিক আরাম নিশ্চিত করার প্রয়াস নেয়া হয়।[৪২]

হসপাইসের রোগী যখন খুশী পরিবারে ফিরে যেতে বা হসপাইসে চলে আসতে পারেন। প্রয়োজনে পরিবারে গিয়েও হসপাইসের কর্মীরা যত্ন নিয়ে আসতে পারেন। চিকিৎসা ও মানসিক সমস্যা লাঘবে হসপাইস খুবই যত্নশীল।[৪৩]

মৃত্যুর প্রতি মনোভাব পরিবর্তনের ইতিহাস

একজন ফরাসী গবেষক (Aries) বিগত ৫০০ বছরে মৃত্যুর প্রতি পাশ্চাত্যবাসীর মনোভাব পরিবর্তনের এক ইতিহাস রচনা করেছেন। তার মতে মধ্যযুগে যদিও মানুষ মৃত্যুকে ভয় পেত তথাপি যেহেতু মৃত্যুহার ছিল বেশি এটা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, নিত্য-দিনের জীবনের অঙ্গ-তাই এটাকে ভয়াবহ বা অস্বাভাবিক মনে করা হয়নি। বাড়ীর আশে পাশেই কবর দেয়া হত।

মধ্যযুগের শেষ দিকে এবং রেনেঁসা যুগে মৃত্যুভীতি বেড়ে যায়। মৃত্যু একটা ভীষণ ভয়াবহ ঘটনা বলে মনে হতে থাকে। কারণ, এ সময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের উন্মেষ ঘটে। ব্যক্তি তার নিজকে, তার সহায়-সম্পত্তি এবং জীবনের ভাল অর্জন গুলোকে বেশি মূল্য দিতে ও সে সবকে ভালবাসতে শুরু করে। মৃত্যুতে ভালবাসার জিনিস চিরদিনের জন্য ছেড়ে যেতে হবে-এ ভয়ে সে ভীত হয়। তাই মৃত্যুর পরও যাতে সে তার সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সে জন্য সম্পত্তির উইল লিখে যেতে সচেষ্ট হয়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। মৃত্যু তখন গবেষনার একটা ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত হয়। মানুষ তখন মৃত্যুকে নিজ থেকে অনেক দুরে অথচ অবশ্যম্ভাবী বলে ধারণা করতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে মৃত্যুর একটা রোমান্টিক ধারণা তৈরি হয়। সাহিত্য ও শিল্পকলায় মৃত্যু শয্যার দৃশ্য দেখানো হতে থাকে। গোরস্থানকে আধুনিক পার্কের মত সাজানো হয় যেখানে পরিবার সদস্যরা মৃতের কবরের পাশে গিয়ে মৃতের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা বা আবেগীয় ভান করে।

বিংশশতাব্দীতে মৃত্যুকে অদৃশ্য শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মৃত্যুকে অস্বীকার করা; মৃত্যু পথযাত্রীকে তার আসন্ন-মৃত্যুর কথা না বলে মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি হলো বর্তমান অবস্থা। মৃত্যু-আসন্ন রোগীদের চিকিৎসার জন্য যেমন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়; প্রচ্ছন্ন ভাবে তাকে আমাদের দৃষ্টির বাইরে রাখার চেষ্টাও সফল হয়। মৃত্যুতে কান্নাকাটি বা বিলাপ করা নিরুৎসাহিত করা হয় এবং মরদেহ যথাশীঘ্র দাফনের মাধ্যমে দৃষ্টির বাইরে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়।[৪৪]

মৃত্যুশোকঃ আত্মীয়-বিয়োগ ও মনস্তাপ

মৃত্যুর প্রতি প্রতিক্রিয়া বা মনোভাবের আরেকটি দিক হলো মৃত্যুশোক। সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে মৃত্যু-শোকের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার অরুন্তা সমাজে মৃত্যুশোকে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকেরা দুঃখ ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আপনজনের বিয়োগ ব্যথায় তাদের কেউ কেউ ভারক্রান্ত হয়। কেউবা-ক্ষোভ-অভিমানে ক্ষনিকের জন্য অস্বাভাবিক আচরণ করে। মেয়ে পুরুষ উভয়ই একে অপরকে আহত করে বসে।[৪৫]

ফ্রয়েডের মতে জীবন ও মরণ প্রবৃত্তির কারণে একজন ব্যক্তি তার স্ত্রী স্বামী বা আপনজনকে কেবল ভালই বাসেনা-ঘৃণাও করে। ঘৃণা করার বিষয়টি অবশ্য প্রায়ই অবদমিত থাকে। তাই আপন জনের মৃত্যুতে জীবিতদের মধ্যে (পূর্বের প্রচ্ছন্ন ঘৃণাবশত) একটা পাপবোধ জাগে এবং মৃতের জন্য তেমন ভাল কিছু করতে পারেনি এমন বোধ থেকে কেউবা মৃত্যুশোকে অভিভূত হয়।[৪৬]

আত্মীয়-বিয়োগ জনিত মনস্তাপের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মৃত্যুর সংবাদে প্রচন্ড মানসিক আঘাত (shock) অনুভূত হয় যা কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে গভীর মনস্তাপ ও মানসিক কষ্টভোগ (grief) লক্ষ্য করা যায়। ফলে ক্ষুধামন্দা, অনিদ্রা, ওজন কমা এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম থেকে নিজকে দূরে রাখতেও চায়। তৃতীয় পর্যায়ে শোকাতুর ব্যক্তির শোকের বোঝা

হালকা হয়ে আসে এবং সে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় (recovery) এবং সামাজিক এবং ব্যক্তিগত কাজ কর্মে মনোনিবেশ করে।[৪৭]

কোন কোন গবেষক[৪৮] আত্মীয় বিয়োগজনিত মনস্তাপের চারটি পর্যায়ের কথাও বলেন যেমন-প্রথম পর্যায়ে মৃত্যুর সংবাদে কোন ব্যক্তি অসাড় হয়ে যায় (numbness)। এবং ঘটনার আকস্মিকতার প্রথমে পুরো বিষয়টা ঠাহর করে উঠতে পারেনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে তার মধ্যে স্নেহ ভালবাসার জোয়ার বইতে থাকে যার ধাক্কায় সে মৃত আপনজনকে ফিরে পেতে মনে মনে খুঁজতে থাকে (yearning)। তৃতীয় পর্যায়ে শোকাতুর ব্যক্তি হতাশ হয় এবং তার মধ্যে অসংগতি দেখা দেয় (despair and disorganization)। ক্রমে সে আপনজনের মৃত্যুজনিত দুঃখ কষ্ট ক্ষতিকে মেনে নেয়। শেষ পর্যায়ে শোকাতুর ব্যক্তি নতুন করে নিজকে সংগঠিত করে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে (reorganization)।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে নবীনদের তুলনায় প্রবীণদের মধ্যে মৃত্যুশোক কিছুটা কম। কেননা তাঁরা জীবনে অনেকবার অনেককে হারিয়ে মৃত্যুশোকে ভুগেছেন। দীর্ঘ জীবনে তাঁরা একটি মৃত্যুর শোক কাটিয়ে উঠতে হয়ত আরও মৃত্যুর শোকে আহত হয়েছেন। এভাবে প্রবীণের মধ্যে এমন একটা অবস্থা তৈরী হতে পারে যে নতুন কোন মৃত্যুর সংবাদে তিনি পুরোপুরি শোকাতুর হবেন না। কেননা, তিনি পুরাতন মৃত্যুর শোকেই আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। এ অবস্থাকে বলা হয়েছে "bereavement overload" বা আত্মীয়-বিয়োগ ব্যাথায় অতিশয় ভারাক্রান্ত[৪৯]

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে সব বিষয় প্রতীয়মান হয় তা হলঃ

এক ⟹ মৃত্যু সম্ভবতঃ একটি তাৎক্ষনিক ঘটনা নয়। এটা একটা প্রক্রিয়া। এবং যদিও মৃত্যুর সংজ্ঞা নির্ধারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভূমিকাই মুখ্য তথাপি এর আইনগত এবং নৈতিক দিককে কোন ক্রমে উপেক্ষা করা যায় না। চিকিৎসা প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে মৃত্যু সর্ম্পকে আমাদের ধ্যান-ধারণায় আরও পরিবর্তন আসতে পারে। কতদিন পর্যন্ত যান্ত্রিক উপায়ে কাউকে বাঁচিয়ে রাখা হবে; এবং এর জন্য পরিবার ও সমাজ অর্থব্যয়সহ কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে- এসব বিষয়ে প্রতিটা সমাজকেই এখন ভাবতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দুই ⟹ মৃত্যুর সঙ্গে সমাজকাঠামোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। মৃত্যু এবং সমাজ একে অপরকে প্রভাবিত করে। মৃত্যু যেমন পরিবার, সমাজ কাঠামো এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপর প্রভাব রাখে, সাময়িক বা স্থায়ীভাবে সমাজের ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটায়-তেমনি সমাজ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সমাজের মূল্যবোধ, প্রথা ও রেওয়াজ অনুযায়ী বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং সমাজের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মৃত্যুকালীন পরিবেশ ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থান দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত।

তিন ⟹ নিজের মৃত্যু, অন্যের মৃত্যু, মৃত্যুর প্রকৃতি, মৃতের মর্যাদা ইত্যাদির উপর মনোভাব নির্ভর করে। সবার মৃত্যু সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। সব মৃতের অন্তেষ্টিক্রিয়া একই মর্যাদায় সম্পন্ন হয় না। সব মৃতের obituary বা সংক্ষিপ্ত জীবনী পত্রিকা বা সাময়িকিতে ছাপা হয় না।

চার ⟹ মৃত্যু এবং মৃত্যু-প্রক্রিয়ার প্রতি মনোভাব প্রধানতঃ নেতিবাচক এবং পরিবর্তনশীল। মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার প্রবণতাই মুখ্য। কেউ কেউ মনে করেন মৃত্যুভীতি সমাজ থেকে শিক্ষণের ফল। কেউ বা মনে করেন এটা মানব অস্তিত্বের স্বাভাবিক পরিণতি বা স্বাভাবিক মানবীয় প্রতিক্রিয়া যা দূর করা সম্ভব নয়। মৃত্যুভীতির কয়েকটি প্রধান কারণ হলঃ মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মরদেহের পরিণতি সম্পর্কে দুশ্চিন্তা; মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরী সন্তান সন্ততি ও তার উপর এতদিন নির্ভরশীলদের কি হবে সেটা নিয়ে দূর্ভাবনা; ধর্ম বিশ্বাসীদের ধর্ম পালনে গাফলতির জন্য শাস্তির ভয়, এই সুন্দর পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকা যাবেনা, আগামীদিনে এ সভ্যতার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন হবে তা দেখা ও ভোগ করা যাবেনা-ইত্যাদি।

পাঁচ ⟹ যদিও মনে করা হয় প্রবীণদের মধ্যে মৃত্যুভীতি বেশি; অথবা বার্ধক্যে মৃত্যুভীতি বৃদ্ধি পায়-তথাপি তা' ইউরোপ এবং আমেরিকান সমাজে পরিচালিত গবেষণালব্ধ তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। বরং এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে প্রবীণের তুলনায় মাঝ-বয়সীদের মধ্যেই মৃত্যুভীতি বেশি। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে পরিচালিত আমার নিজস্ব গবেষনায় (মতামত জরিপ) দেখা যায় যে বার্ধক্যে মৃত্যুভীতি বরং বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে তাই আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বার্ধক্যে মৃত্যুভীতি যদি বৃদ্ধিই পায় তবে আর কারণ উৎঘাটনের জন্য আরো গবেষণা প্রয়োজন।

ছয় ⇒ মৃত্যুর প্রতি মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যু-পুর্ব মনোভাবের কয়েকটি পর্যায় যেমন মৃত্যু অস্বীকার, রাগ-রোষ, মৃত্যুর সঙ্গে দর কষাকষি (আমাদের সমাজে আমরা যাকে বলি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে), অবসাদ গ্রস্থতা বা হতাশা এবং মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পন লক্ষ্য করা যায় যা এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সৃষ্টি করে।

সাত ⇒ সচেতন লোকেরা মৃত্যুর আগেই তার করনীয় কাজ গুলো গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন।

আট ⇒ ইদানিংকালে মৃত্যুর স্থান পরিবর্তিত হচ্ছে (বাড়ী থেকে হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি)। ফলে, মৃত্যু ক্রমশঃ অদৃশ্যরুপ ধারণ করছে। আমলাতান্ত্রিক ও যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আপন জনের অনুপস্থিতে মৃত্যু হচ্ছে। এতে মৃত্যু-আসন্ন রোগী আপন জন থেকে মানসিক সান্তনা, সেবা ও সহানুভূতি পাচ্ছে না । বস্তুতঃ মুমূর্ষু রোগী হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বাড়ী ত্যাগ করার সময় থেকেই সামাজিক গুরুত্ব হারাতে থাকেন; সমাজ থেকে তাঁর দূরত্ব বেড়ে যায়। অর্থ্যাৎ রোগীর সামাজিক মৃত্যু ঘটে এবং তারপর মনস্তাত্ত্বিক এবং মেডিকেল মৃত্যু আসন্ন হয়ে পড়ে।

নয় ⇒ মৃত্যু পথযাত্রী রোগী তার আসন্ন মৃত্যু সংবাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন-যার পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি দেয়া হয়েছে।

দশ ⇒ ইউরোপ ও আমেরিকায় মৃত্যুর অধিকার একটি আইনগত অধিকার হিসাবে রুপ নেবে কিনা, অথবা তা ঠিক হবে কিনা সে বিষয়ে ভেবে দেখার অবকাশ আছে। সেখানে কোন কোন রোগী মুমূর্ষু দশায় উপনীত হবার আগেই তাঁর মৃত্যু এবং আধুনিক জীবন রক্ষাকারী প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে সেক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করার অধিকার অথবা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে জীবন রক্ষাকারী প্রযুক্তি সরিয়ে নেয়ার অধিকার চিকিৎসককে প্রদানের ব্যাপারটি অদ্যাবধি বিতর্কিত বিষয়।

এগার ⇒ হসপাইস ব্যবস্থা ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। কেননা হসপাইস হচ্ছে বাড়ী এবং হাসপাতালে মৃত্যুর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তির মধ্যে এক সমঝোতার ফল।

বার ⇒ যত আপনজনই মৃত্যু বরণ করুক না কেন মৃত্যুশোক মূলতঃ সাময়িক। মুত্যুশোক, মৃতের প্রতি সমবেদনা এবং মৃতের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠান পরিবার তথা সমাজের মধ্যে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্যনির্দেশ

১. গ্রীক শব্দ thanatos অর্থ death বা মৃত্যু। রুশ-জীববিজ্ঞানী Elie Metchnikoff thanatology শব্দটি চয়ন করেন। মৃত্যু সম্পর্কে specialized discipline ই হলো থ্যানাটোলজী বা মৃত্যুবিদ্যা। তবে gerontology বা জরাবিজ্ঞানও প্রসঙ্গক্রমে বার্ধক্য ও মৃত্যু সম্পর্কে অধ্যয়ন করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, একই রুশ বিজ্ঞানী (Elie Metchnikoff) গ্রীকশব্দ geront (old man) এবং logos (study) থেকে gerontology শব্দটিও চয়ন করেন। Gerontology বা জরাবিজ্ঞান বয়োবৃদ্ধির জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বিষয়ে গবেষণা করে।

২. Lynne Ann Despelder, *The Last Dance: Encountering Death and Dying.* NY: L Mayfield Publishing Co (1983).

৩. দেখুন, প্রাগুক্ত Despelder (1983), পৃঃ ২৬৪।

৪. দেখুন, Diana K Harris, *Dictionary of Gerontology.* NY: Greenwood Press (1988).

৫. এ সম্পর্কে আরও জানার জন্য অত্র প্রবন্ধের "জীবন-বর্ধক প্রযুক্তি ও মৃত্যুর প্রতি পরিবর্তনশীল মনোভাব" সম্পর্কিত আলোচনাটুকু দ্রষ্টব্য।

৬. দেখুন, প্রাগুক্ত Harris (1988).

৭. এ সম্পর্কে অধিক জানার জন্য দেখুন, Bert Jr Hayslip. *Adult Development and Aging,* NY : Harper and Row (1989).

৮. সমাজবিজ্ঞানী বটমোর (Bottomore) সমাজ কাঠামো ব্যাখ্যায় মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন যেগুলোকে functional pre-requisites of society বা সমাজের ক্রিয়াবাদী পূর্ব শর্ত বলে মনে করা হয়। এগুলোর অন্যতম একটি পূর্ব শর্ত হলো আচার-অনুষ্ঠান ব্যবস্থা যা সামাজিক সংহতি রক্ষা ও বৃদ্ধি করে এবং ব্যক্তির জন্ম, যৌবনপ্রাপ্তি, প্রেম, বিবাহ ও মৃত্যুকে সামাজিক স্বীকৃতি বা গুরুত্ব দেয় (দেখুন Bottomore, T.B. *Sociology: A Guide to Problems and literature*. London: George Allen and Unwin (1981).

৯. সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Radcliffe-Brown ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সব ধরণের সামাজিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে a system of communication বা যোগাযোগ বা ভাব বিনিময় ব্যবস্থা হলো Bottomore কর্তৃক উল্লেখিত সমাজের ক্রিয়াবাদী পাঁচটি পূর্ব শর্তের আর একটি (প্রথমটি) দেখুন, প্রাগুক্ত Bottomore (1981).

১০. দেখুন, Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* NY : Macmillan. (1915).

১১. এ সম্পর্কে অধিক জানার জন্য দেখুন, Russel A Ward, *The Aging Experience: An Introductin to Social Gerontoloy*, NY: Harper & Row (1984), pp. 320-321.

১২. দেখুন, প্রাগুক্ত Ward (1984), p. 320.

১৩. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Aries Philippe, *The Hour of Our Death*, NY: Knopf (1981).

১৪. দেখুন, প্রাগুক্ত Ward (1984).

১৫. দেখুন, প্রাগুক্ত Ward (1984), পৃ ঃ ৩২১।

১৬. দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩২১।

১৭. দেখুন, প্রাগুক্ত Hayslip (1989).

১৮. দেখুন, প্রাগুক্ত Ward (1984), পৃ ঃ ৩২২।

১৯. এ সম্পর্কে আরও জানতে হলে দেখুন, David L Decker, *Social Gerontology: An Introduction to the Dynamics of Aging*, Boston: Little Brown and Co. (1980).

২০. দেখুন, প্রাগুক্ত Despelder (1983), পৃঃ ১৯।

২১. দেখুন, প্রাগুক্ত Despelder (1983).

২২. দেখুন, Robert, Kastenbaum, *The Psychology of Death*, NY: Springer (1976); Richard Schulz, *The Psychology of Death. Dying and Bereavement*, Mass.: Addison Wesley (1978); James, Diggory, "Values Destroyed by Death" *Journal of Abnormal and Social Psychology*: (1961)63:205-10.

মৃত্যুভীতি এবং মৃত্যুভীতির কারণ সম্পর্কে পরিচালিত আমার গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মোট উত্তর দাতার সংখ্যা ১০০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭৬ এবং মহিলা ২৪ জন। একজন ছাড়া সবাই বর্তমানে নগর জীবনের অধিবাসী। এরা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ।

উত্তরদাতাদের বয়স	সংখ্যা
২০-৩৯	৫৫
৪০-৫৯	৩৯
৬০-৭৯	০৩
৮০+	০৩
	মোট ১০০

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	পেশা	জন
এস.এস.সি লেভেল	০৭ জন	চাকুরী	২৮
এইচ.এস.সি লেভেল	১০ জন	শিক্ষকতা	১৬
ডিগ্রী লেভেল	৩২ জন	চিকিৎসা	০৭
মাষ্টার্স/এম.বি.বি.এস	৪৭ জন	গৃহকর্ম	১১

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	পেশা	জন
এস.এস.সি লেভেল	০৭ জন	চাকুরী	২৮
এইচ.এস.সি লেভেল	১০ জন	শিক্ষকতা	১৬
ডিগ্রী লেভেল	৩২ জন	চিকিৎসা	০৭
মাষ্টার্স/এম.বি.বি.এস	৪৭ জন	গৃহকর্ম	১১
পি.এইচ.ডি	০৪ জন	শিক্ষার্থী	২৩
		আইন ব্যবসা	০৭
		সাংবাদিকতা	০১
		প্রকৌশলী	০১
		ব্যবসা	০২
		অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবি	০৩
		বেকার	০১
	মোট ১০০ জন		মোট ১০০

মৃত্যুভীতি সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লিখে উত্তর দাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। তারা সম্পূর্ন একমত, আংশিক একমত এবং দ্বিমত এ তিন ধরণের উত্তর দিয়েছেন :

আমি আমার মৃত্যু নিয়ে কখনও মোটেই দুশ্চিন্তা করি না। (সম্পুর্ন একমত ৪০ জন; আংশিক একমত ২৮ জন এবং দ্বিমত ৩২ জন)। **মৃত্যুর কথা মনে হলে মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হয়ে যায়** (সম্পুর্ন একমত ৪০ জন, আংশিক একমত ৩৪ জন এবং দ্বিমত ২৬ জন)। **মৃত্যুকে আমি এতই ভয় পাই যে, মরদেহ/মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এড়িয়ে চলি** (সম্পুর্ন একমত ৫ জন; আংশিক একমত ৬ জন এবং দ্বিমত ৮৯ জন)। **বার্ধক্যে মৃত্যুভীতি বৃদ্ধি পায়** (সম্পুর্ন একমত ৫৯ জন; আংশিক একমত ৫ জন, দ্বিমত ১৯ জন এবং উত্তর দেননি ১৭ জন)।

আমার মৃত্যু আমার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের দুঃখ দেবে (সম্পুর্ন একমত ৫১ জন; আংশিক একমত ২৭ জন এবং দ্বিমত ২২ জন)। **মৃত্যু সম্ভবত খুবই যন্ত্রনাদায়ক ব্যাপার** (সম্পুর্ন একমত ৩২ জন; আংশিক ,একমত ৩৫ জন এবং দ্বিমত ৩৩ জন)। **আমার উপর যারা নির্ভরশীল বা যারা আমার পোষ্য তাদের আর কোন যত্ন নিতে পারবনা** (সম্পুর্ন একমত ৫৩ জন; আংশিক একমত ২৩ জন, দ্বিমত ২২ জন এবং উত্তর দেননি ২ জন)। **মৃত্যুর পর আমার সহায়-সম্পত্তি ও অর্থ বিত্তের কি হবে সেটা নিয়ে আমি বেশ বিচলিত** (সম্পুর্ন একমত ৭ জন; আংশিক একমত ২১ জন, দ্বিমত ৫৭ জন এবং উত্তর দেননি ১৫ জন)। **মৃত্যুর পর আমার কি হবে বা ভাগ্যে কি ঘটবে সেটা নিয়ে আমি বেশ ভীত**- (সম্পুর্ন একমত ৪৮ জন; আংশিক একমত ২১ জন, দ্বিমত ৩০ জন এবং উত্তর দেননি ১ জন)। **আমার মরদেহের অবস্থা কি হবে সেটা ভেবে আমি বেশ ভীত**- (সম্পুর্ন একমত ২৬ জন; আংশিক একমত ১৪ জন, দ্বিমত ৬০ জন)।

২৩. দেখুন, R.A. Kalish, *Death and Ethnicity*. A Psycho-Cultural Study, NY: Baywood (1981); J.W. Keller, "Perspectives on death: A developmental study". *Journal of Psychology*. 116, 137-42. (1984) এবং Diana k Harris, *Sociology of Aging*. N.Y.: Harper and Row 1990).

২৪. অধিক জানতে হলে দেখুন প্রাগুক্ত Hayslip (1989) এবং Harris (1990).

২৫. দেখুন, প্রাগুক্ত Harris (1990).

২৬. দেখুন, প্রাগুক্ত Ward (1984), p. 326.

২৭. দেখুন, প্রাগুক্ত Ward (1984).

২৮. দেখুন, প্রাগুক্ত Ward (1984).

২৯. দেখুন, প্রাগুক্ত Hayslip (1989).

৩০. এ সম্পর্কে বিশদ জানার জন্য দেখুন Victor Marshall, *Last Chapters: A Sociology of Aging and Dying*. Monterey, Calif.: Brooks/Cole. (1980) এবং Richard, Kalish, *Death, Grief, and Caring Relationship*. Monterey, Calif: Brooks/Cole. (1981).

৩১. দেখুন, Elisabeth Kubler-Ross, *On Death and Dyiing*. NY: Macmillan (1969) এবং Harris প্রাগুক্ত (1990).

৩২. দেখুন, প্রাগুক্ত Harris (1990), পৃ ঃ ৪১৯-৪২০।

৩৩. যখন রোগী ছাড়া সবাই জানে যে, রোগী শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে তখন তাকে closed awareness বলা হয়। যখন রোগী তার অবনতি অনুধাবন করে এবং চিকিৎসার সাফল্যের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তখন তাকে suspicious awareness বলা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে রোগী, ডাক্তার ও রোগীর পরিবারবর্গ সবাই জানে যে, রোগীর অবস্থার শোচনীয় অবনতি ঘটেছে-অথচ কেউ কারো কাছে সেটা বলছে না-মৃত্যু যেন আসন্ন নয়-রোগী ভাল হচ্ছে-হবে-এমন একটা অভিনয় সবাই করে-এ অবস্থার নাম mutual pretense awareness শেষ পর্যায়ে রোগীসহ সবাই খোলামেলা ভাবে জানে রোগীর অন্তিম অবস্থা তখন আর গোপনীয়তা থাকে না, এটাকে Open awareness বলা হয় (দেখুন প্রাগুক্ত Harris 1990:420).

৩৪. দেখুন B.G. Glaser, *Awareness of Dying*, Chicago: Aldine (1965) এবং প্রাগুক্ত Harris (1990).

৩৫. দেখুন প্রাগুক্ত Harris (1990).

৩৬. দেখুন প্রাগুক্ত Harris (1990).

৩৭. এ সম্পর্কে আরও জানতে হলে দেখুন R.S. Morison, "Death: Process or Event?", *Science*. 173. 694-98 (1971) এবং Harris প্রাগুক্ত (1990), পৃ ঃ ৪২২।

৩৮. গ্রীক euthanasia অর্থ "ভাল মৃত্যু (good death) । মৃত্যুবিদ্যা এবং জরাবিজ্ঞানে মরণাপন্ন রোগীকে মৃত্যুবরণ করার অনুমতি প্রদানকে ইউথ্যানাসিয়া বলে। কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে না রেখে বা যন্ত্র সরিয়ে নিয়ে রোগীকে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেয়ার নাম passive euthanasia; যে রোগী আর মোটেই ভাল হবার নয় অথচ কষ্ট পাচ্ছে তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করার যে উদ্যোগ তাকে বলে active euthanasia. Active এবং passive euthanasia এর মাঝে সুস্পষ্ট ভেদ রেখা নির্ণয় করা খুবই কষ্টকর। যে রোগী মানসিকভাবে সুস্থ ও সচেতন তিনি active বা passive euthanasia র জন্য আগেভাগে ডাক্তারকে অনুমতি দিতে বা অনুরোধ করতে পারেন। একে বলে voluntary

euthanasia. সংজ্ঞাহীন রোগীকে active বা passive euthanasia দেয়ার নাম involuntary euthanasia.

৩৯. দেখুন C. Berdes, *Social Services for the Aged.* Washington, D.C: International Federation of Aging (1978) এবং Harris প্রাগুক্ত (1990), পৃ ঃ ৪২৪।

৪০. দেখুন প্রাগুক্ত Harris (1990).

৪১. দেখুন প্রাগুক্ত Decker (1980).

৪২. দেখুন David Popenoe, *Sociology.* New Jersey: Prentice Hall (1986).

৪৩. দেখুন প্রাগুক্ত Decker (1980).

৪৪. দেখুন প্রাগুক্ত Aries (1981); Ward (1984) এবং Popenoe (1986).

৪৫. দেখুন মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা: হাসান বুক হাউস (১৯৯৪)।

৪৬. দেখুন Victor Barnouw, *An introduction to Anthropology: Ethnology*, George Town: The Dorsey Press (1978).

৪৭. দেখুন প্রাগুক্ত Harris (1990).

৪৮. দেখুন প্রাগুক্ত Decker (1980).

৪৯. দেখুন Robert Kastenbaum,"*Death and Bereavement in Latter Life*" in A. Kutscher (ed) Death and Bereavement. Spring Field : C.C. Thomas. (1969) এবং প্রাগুক্ত Harris (1990).